লোকপ্রশাসন সাময়িকী
চতুর্দশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৌষ ১৪০৬

ব্রিটিশ ভারতে সিভিল সার্ভিসের সংস্কার
একটি পর্যালোচনা

মোঃ শরীফ হাছান

Reforms in British Indian Civil Service : *A Review*

Md. Sharif Hasan

Abstract: British dominance in India began since June 23, 1757, with the victory of the English rulers in the Battle of Plassey. Within 1857, the whole of India went under the British rule. They began modernizing administrative system in India by phases through different reform committees. Initially, the Indians were almost kept off administrative and other jobs. Later, Indians were recruited in government jobs in increased number. By this the British rulers tried to retain their empire by appeasing the native people. The native civil servants mostly worked as the British Imperialists agents. Of course, there were few exceptions. Even, communalism was patronized by them. They were Indians in body but at heart they were British. British rule ended more than half a century ago. But still now, many of our civil servants keep colonial lagacy in mind, which is unfortunate. It can be stated as a success of the imperalist British rulers. This article aims to analyse various reforms of the Indian Civil Service introduced by the British rulers from 1780 to 1930 and their impact on the society and politics of India.

ভূমিকা

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভের কাছে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের সূচনা হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে "এটা (পলাশীর যুদ্ধ) বাংলায় এবং প্রকৃত পক্ষে সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের সূচনা করে"। ১৮৫৭ সালের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যর্থতার মাধ্যমে সমগ্র ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যবর্তী (১৭৫৭-১৮৫৭) একশ' বছর ভারত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দ্বারা শাসিত হয়। ১৮৫৮ সালে রাণী ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণা বলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর স্থলে নিজেই ভারত শাসনভার গ্রহণ করেন। অতএব দেখা যায় যদিও পলাশীর যুদ্ধে মাত্র পাঁচশতের মতো লোক হতাহত হয়, অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতিও তেমন বেশী হয়নি- এর মাধ্যমে সমগ্র ভারতের ইতিহাসের

সহকারী পরিচালক, বিপিএটিসি।

গতিপথ দিক পরিবর্তন করে। একমাত্র ব্রিটিশ শাসকরাই সমগ্র ভারতকে অভিন্ন শাসন ব্যবস্থার অধীনে আনতে সক্ষম হন। এর পূর্বে অখন্ড ভারত শুধু কবির কল্পনা এবং কিংবদন্তীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো।

ব্রিটিশ শাসন ও আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থা

ইউরোপে যখন আধুনিকতার জয় জয়কার, ভারত তখনো মধ্যযুগীয় অন্ধকার, ক্ষেত্রবিশেষে প্রাচীন যুগের কুসংস্কারে নিমজ্জিত। নিজেদের সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে ভারতীয়রা ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা তথা আধুনিকতার আলোয় উদ্ভাসিত হওয়ায় সুযোগ পায়। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের মতো আধুনিকমনস্ক মহাপুরুষ অংশতঃ ব্রিটিশ শাসন এবং এ থেকে সৃষ্ট আধুনিকতারই ফসল। তবে সেজন্য ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার, নির্যাতন সর্বোপরি নির্বিচার লুণ্ঠনকে কখোনোই খাটো করে দেখা যাবে না। তবে এ সময় বিশেষ করে শিক্ষা এবং প্রশাসন ব্যবস্থায় আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। প্রাক-ব্রিটিশ যুগের ভারতে প্রশাসন ব্যবস্থা মোটেই সংগঠিত ছিলোনা। কর্মচারিদের চাকুরীর স্থায়িত্ব শাসকের সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের জায়গীর দেয়া হতো। কখনো কখনো নগদ অর্থেও বেতন দেয়া হতো। নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিবর্তে দেখা হতো বংশ পরিচয়। ভারতে সুশৃঙ্খল প্রশাসন ব্যবস্থা এবং মেধা ভিত্তিক নিয়োগ ব্রিটিশ শাসনেরই অবদান। তবে তাঁরা ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ততটুকু আধুনিকায়নই অনুমোদন করেছে যতটুকু তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকূলে ছিলো। একথা প্রশাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পলাশীর যুদ্ধের তিন বছর পর অর্থাৎ ১৯৬০ সালকে ব্রিটেনে শিল্প-বিপ্লবের সূচনাকাল বলে ধরা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক অগ্রগতি এবং ভারত থেকে লুণ্ঠিত সম্পদের বিপুল যোগান শিল্প বিপ্লবকে তরান্বিত করে। এ থেকে ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের লুণ্ঠনের ভয়াবহতা সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের যাবতীয় কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য ছিলো শোষণ ও লুণ্ঠনের এ প্রক্রিয়াকে নিষ্কন্টক রাখা। ব্রিটিশ শাসনামলে প্রাপ্ত অন্যান্য শুভ-অশুভ সব ফলাফলই মূলতঃ এ লক্ষ্যেরই উপজাত- এ কথা নিসংশয়ে বলা যায়। তবে নবাবী আমলের অসংগঠিত, বিশৃঙ্খল প্রশাসন ব্যবস্থার তুলনায় ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসন ব্যবস্থা অনেক সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল ছিলো।

প্রধান প্রধান সংস্কারসমূহ

প্রায় দু'শ বছরের শাসনে ভারতীয় প্রশাসনে যতো সংস্কার ও আধুনিকায়ন হয়েছে পূর্ববর্তী এক হাজার বছরেও তা হয়নি। এ সময় পুরনো কাঠামোকে যে সম্পূর্ণ

নাকচ করা হয়েছে তা বলা যাবে না। অনেক বিষয় যেমন পরিবর্তিত হয়েছে তেমনি জেলা, মহকুমা, থানা হাকিমসহ পূর্ববর্তী আমলের অনেক শব্দই ব্রিটিশ শাসকেরা অক্ষুন্ন রাখে। সম্রাট শেরশাহ এবং মহান মুঘল সম্রাট আকবরের কাছে অনেক ব্রিটিশ লেখকও ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়ে ঋণের কথা উল্লেখ করেছেন।

লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-৯৩) এর সংস্কার

লর্ড কর্নওয়ালিসের সর্বপ্রধান পরিচয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তক হিসেবে। তবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তিনি কিছু সংস্কার সাধন করেন। কর্নওয়ালিস ১৭৯০ সালে তৎকালীন বাংলার নামসর্বস্ব নবাবের ফৌজদারী বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতার অবসান করে কলকাতায় সদর নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। তেইশটি জেলায় কালেক্টরদের ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেয়া হয়। কালেক্টরদের রাজস্ব সংক্রান্ত বিচার ক্ষমতা বাতিল করে দেওয়ানী বিচারকের হাতে ন্যস্ত করা হয়। কোম্পানীর কর্মচারীদের কার্যপদ্ধতির জন্য তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস এর ঐতিহ্য স্থাপন করেন। কর্মচারীদের নিয়মানুবর্তিতা ও নৈতিক চরিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করে কিছু নিয়ম কানুন প্রবর্তন করেন। এগুলো সিভিল সার্ভিস কোড নামে পরিচিত। 'জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণায়' বিশ্বাসী কর্নওয়ালিস ভারতীয়দের পরিবর্তে কেবল মাত্র ইউরোপীয় কর্মচারী নিয়োগের নীতি গ্রহণ করেন। ফলে ভারতীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করে কর্নওয়ালিস আশা করেছিলেন যে এর ফলে তাদের সততা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়নি।

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক (১৮২৮-৩৫) এর সংস্কার

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের শাসনামল নানা দিক দিয়ে স্মরণীয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে অনগ্রসর ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশদের নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। এরূপ বিশ্বাস থেকেই তিনি নানা ধরনের সংস্কারের ব্রতী হন। তাঁর সবচেয়ে মহান কীর্তি সতীদাহ প্রথার মতো বর্বর কুপ্রথার বিলোপ সাধন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তাঁর সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত ভ্রাম্যমাণ আদালত ও প্রাদেশিক আপিল আদালতগুলি বেন্টিংক বাতিল করেন। ফৌজদারী মামলার দায়িত্ব জেলার বিচারকদের হাতে ন্যস্ত করা হয়। কালেক্টরদের হাতে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। কয়েকটি জেলা নিয়ে একেকটি ডিভিশন বা বিভাগ গঠিত হয়। প্রতিটি ডিভিশনের জন্য কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জজ ও পুলিশের

কাজের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব কমিশনারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। বেন্টিংক গুণানুযায়ী ভারতীয়দের সরকারি চাকুরীতে নিয়োগের বাবস্থা করেন। ভারতীয়দের মধ্য থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নিয়োগের রীতি চালু করা হয়। আদালতে ফার্সীর পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার প্রবর্তিত হয়। বেন্টিংক লর্ড মেকলের সভাপতিত্বে একটি আইন-কমিশন গঠন করেন। মেকলের প্রচেষ্টায় বিখ্যাত 'ভারতীয় পেনাল' কোড রচিত হয়।

১৮৩৩ সালে প্রণীত হয় সনদ আইন। এ আইনে বলা হয় "ধর্ম, জন্মস্থান, বংশ, বর্ণ প্রভৃতির জন্য ব্রিটিশ ভারতের কোন ব্যক্তি ও ভারতে বসবাসরত ব্রিটিশ রাজ্যের কোন প্রজা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কোন কর্ম বা চাকুরী ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষিত হবেন না।"

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কোম্পানীর শাসনের অবসান

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে সমগ্র ভারতব্যাপী এক মহাবিদ্রোহ দেখা দেয়। এ স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এবং তাঁদের কতিপয় এদেশীয় দোসর 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে অভিহিত করে এর গুরুত্বকে খাটো করতে চান। সংগ্রামীরা প্রায় এক বছর পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসকদের ব্যতিব্যস্ত রাখলেও প্রধানত অনুন্নত অস্ত্রশস্ত্র এবং দেশীয় কিছু লোকের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে এ বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। বিদ্রোহ অবসানের পর ১৮৫৮ সালের ২রা আগষ্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এক আইন পাশ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে ভারত শাসনভার ন্যস্ত করে। ব্রিটিশ কেবিনেট মন্ত্রীদের মধ্য হতে একজনকে ভারত সচিবের পদে নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি কাউন্সিলের সাহায্যে ভারতের শাসন কার্য পরিচালনা করবেন বলে স্থির হয়। ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রতিনিধি হিসেবে গভর্নর জেনারেলকে ভাইসরয় বা রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। এ সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর ঘোষণায় বলেন " জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমাদের সকল প্রজা তাঁদের শিক্ষা, সামর্থ্য ও ক্ষমতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কর্ম ব্যবস্থায় অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে নিযুক্ত হবেন"।

ইতোপূর্বে ১৮৫৩ সালের সনদ আইনের মাধ্যমে সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতামূলক করা হয়েছিলো। ১৮৬১ সালের কাউন্সিল আইনের মাধ্যমে শ্রেণীকরণ নীতি ত্যাগ করা হয় এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই কাউন্সিলেকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। নতুন কাউন্সিল আইন অনুসারে ভারতের নতুন আইন সভা গঠিত হয়।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তকরণের দাবী

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার পর ভারতীয়দের মনে সিভিল সার্ভিসে স্থান লাভের উচ্চাশা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাস্তব অবস্থার তেমন পরিবর্তন হয়নি এবং ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তির তেমন চেষ্টাও করা হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে ভারতীয়দের দাবী সুস্পষ্ট খাতে প্রবাহিত হয়। এ দাবীর দু'টো লক্ষ্য ছিলো ঃ (ক) ব্রিটিশ ভারতে একই সাথে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং (খ) বয়ঃসীমা বৃদ্ধি। এ দাবী ভারত ও ব্রিটেন উভয় দেশেই জোরালোভাবে উত্থাপিত হতে থাকে। অনেক ব্রিটিশ লেখকও ব্রিটিনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের নিয়োগের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এলফিনষ্টোন বলেন যে, ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে ভারতীয়দের দূরে সরিয়ে রাখার নীতি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত নাড়িয়ে দিতে পারে।

এ প্রসংগে লর্ড মেকলে বলেছিলেন,"এ মুহূর্তে এমন এক শ্রেণী সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে যে শ্রেণী আমাদের ও লক্ষ লক্ষ শাসিতের মধ্যে ব্যাখ্যাকারীর ভূমিকা পালন করবে। এ শ্রেণী এমন এক শ্রেণী হবে যারা রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, অভিমত, নীতিবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ"। দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বাধীন বাংলাদেশের অনেক সরকারি চাকুরেই মেকলে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ অন্তরে লালন করেন। ব্রিটিশ শোষণে অতীষ্ঠ জনগণের ক্ষোভকে কিছু চাকুরী প্রদানের মাধ্যমে স্বাধীনতার দাবীতে পরিণত হতে না দেয়ার প্রয়াস থেকেও সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়করণের উদ্যোগের দাবী উচ্চারিত হতে থাকে। অবশ্য সব ইংরেজই উল্লিখিত ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ ভালো ইংরেজ এবং খারাপ ইংরেজের ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। কোন কোন ইংরেজ ভারতবাসীদের কল্যাণ কামনা থেকেও সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়করণকে সমর্থন করেছিলেন।

সংবিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস

ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিস ভারতীয়করণের দাবীর মুখে ১৮৭০ সালে একটি আইন প্রণীত হয়। এ আইনে বলা হয় যে, ভারতের কর্ম ব্যবস্থায় সপরিষদ ভারত সচিবের মঞ্জুরীর ভিত্তিতে সপরিষদ গভর্নর জেনারেল কর্তৃক স্বীকৃত নিয়ম- পদ্ধতি অনুযায়ী ভারতীয়দের নিয়োগদান করা হবে। এ আইনে যে নিয়ম-পদ্ধতি স্থির করা হয় তাকে কেন্দ্র করে, ভারত সরকার ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। ফলে এ আইনকে কার্যকরী করতে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত সময় লেগে যায়।

এ আইনে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের এক ষষ্ঠংশ পদ ভারতীয়দের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। স্থানীয় প্রশাসন এসব ভারতীয় প্রার্থীকে মনোনীত করতেন। সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের অনুমোদনক্রমে ভারত সচিব কর্তৃক এরা নিয়োগ পেতেন। এ আইনে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ সংবিধিবদ্ধ প্রশাসনিক কর্মকর্তা নামে পরিচিত হতেন। ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত এ আইনের অধীনে মোট ৪৮ জন ভারতীয় নিয়োগ লাভ করেন।

সংবিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস ভারতীয়দের সন্তষ্ট করতে পারেনি। কারণ এ সার্ভিসের জন্য মনোনীত কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট পদের জন্য মনোনীত করা হতো। তাঁরা ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য বলে গণ্য হতেন না । তাঁরা সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের চেয়ে কম বেতন পেতেন এবং পদমর্যাদায়ও সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের চেয়ে নীচে ছিলেন। নিয়োগদানের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতির প্রচুর অভিযোগে ছিলো। মেধার বদলে বংশগত আভিজাত্য যোগ্যতার মাপকাঠি হওয়ায় তা সমালোচিত হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের পরিবর্তে মনোনয়নের পদ্ধতিকে অনেকেই অসম্মানের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ফলে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের নিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে সংবিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এটা ভারতীয়দের ক্ষোভ প্রশমনেও ব্যর্থ হয়।

এচিসন কমিশন (১৮৮৬-৮৭)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের অর্ন্তভুক্ত করার দাবী জোরদার হয়ে ওঠে। ১৮৮৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর বোম্বেতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কংগ্রেস ভারতীয়দের অধিক সংখ্যায় চাকুরীতে নিয়োগের জন্য সচেষ্ট হয়। অবশ্য প্রথমদিকে কংগ্রেসের কর্মকান্ড প্রধানতঃ সংক্রান্ত দাবী দাওয়া উত্থাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ আমলা এলান অক্টোভিয়ান হিউমের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের পক্ষে তখন স্বাধীনতা কিংবা স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপন করা ছিলো অচিন্ত্যনীয়। হিউম কংগ্রেসকে ব্রিটিশ সরকারের 'সেফটি ভাল্ব' অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক কাজের প্রতিরোধক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রার্থীদের বয়ঃসীমা বৃদ্ধি দাবী করে। কংগ্রেস সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা একই সংগে ভারত ও ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠান, এবং প্রার্থীদের বয়স ২৩ বছরে উন্নীত করার সুপারিশ করেন। এ সকল দাবীর

পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ১৮৮৬ সালে পাঞ্জাবের গভর্নর লর্ড এচিসনের সভাপতিত্বে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করেন। এটি 'এচিসন কমিশন' নামে পরিচিত। কমিশনের লক্ষ্য ছিলো এমন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা যা প্রশাসনের উচ্চতর পর্যায়ে ভারতীয়দের নিয়োগের দাবীর প্রতি পূর্ণ সুবিচার করতে পারে ও কর্মব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে।

এচিসন কমিশন যুগপৎ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দাবী নাকচ করে। কারণ কমিশনের মতে প্রথমতঃ এ পরীক্ষায় ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান পরিমাপ করা হবে। ইংল্যান্ড ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের কেন্দ্র ভূমি। তাই ইংল্যান্ডেই এ পরীক্ষা হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ ভারতের মাটিতে পরীক্ষা হলে বহু সংখ্যক প্রার্থী অংশগ্রহণ করবে এবং অল্প সংখ্যক প্রাথী উত্তীর্ণ হবে। বিপুল সংখ্যক প্রার্থী সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সৃষ্টি করবে । তৃতীয়তঃ এতে প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা সংরক্ষিত নাও থাকতে পারে।

কমিশন প্রার্থীদের বয়ঃসীমা বৃদ্ধির দাবী সমর্থন করে। কমিশনের মতে ভারতীয় যুবকেরা অল্প বয়সে পরীক্ষায় সফলতার উপযোগী শিক্ষা লাভে সক্ষম হতো না । কমিশন প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়স ২৩ বছর ও সর্বনিম্ন বয়স ১৯ বছর ধার্য করার সুপারিশ করে।

ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলোকে পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবী কমিশন প্রত্যাখান করে। পূর্বে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আরবী ও সংস্কৃতে নির্দিষ্ট ছিলো ৫০০ নম্বর, কিন্তু ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় যথাক্রমে ৮০০ ও ৬৬০ নম্বর ছিলো। কমিশন আরবী ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এগুলোকে ল্যাটিন ভাষার সমান মর্যাদা প্রদানের সুপারিশ করে।

কমিশনের মতে, সংবিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস ভারতীয়দের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিযোগিতার পরিবর্তে মনোনয়নের ফলে তোষণনীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের অযোগ্য সন্তানেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাকুরী পেয়েছেন। পদমর্যাদা নিম্ন হওয়ায় এর আবেদনও হ্রাস পেয়েছে। অতএব কমিশন এর বিলুপ্তির সুপারিশ করে। কমিশন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসকে 'ইম্পিরিয়াল সিভিল সার্ভিস অব ইন্ডিয়া' নামকরণের প্রস্তাব করে। এটা গৃহীত হয়নি। বাস্তবে নামকরণ হয় 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস'। এছাড়া কমিশন প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস প্রতিষ্ঠা এবং নিম্ন পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মের জন্য 'অধঃস্তন সিভিল সার্ভিস' গঠনের সুপারিশ করে। অধঃস্তন সিভিল সার্ভিসের সদস্যগণ যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করতে পারবেন।

প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের শূন্য পদগুলো অংশতঃ পদোন্নতি এবং অংশত নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।

এচিসন কমিশনের অধিকাংশ সুপারিশই বাস্তবায়িত হয়। সংবিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসের অবসান হয় এবং প্রাদেশিক ও অধঃস্তন সিভিল সার্ভিসের গোড়াপত্তন হয়। প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ২৩ বছরে উন্নীত হয়। চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসের এক ষষ্ঠাংশ পদ প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের জন্য সংরক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে এ পদগুলো 'তালিকাভুক্ত পদ' হিসেবে চিহ্নিত হয়।

ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজকীয় (ইসলিংটন) কমিশন, ১৯১২

এচিসন কমিশনের সুপারিশ ভারতীয়দের খুশী করতে ব্যর্থ হয়। ভারতে উচ্চ শিক্ষার প্রসার এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়করণের দাবী বিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রবল হয়ে ওঠে। ১৯০২ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রশাসনের ভারতীয়করণের দাবীতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন। আগাখান, এম এ জিন্নাহ, স্যার আব্দুর রহিম প্রমুখ মুসলিম নেতা প্রশাসনে অধিক সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগ এবং সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা ইংল্যান্ডের পাশাপাশি ভারতে অনুষ্ঠানের দাবী করেন। প্রশাসনিক জটিলতা, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি কারণে প্রশাসন সংস্কার এবং কর্মকর্তাদের বেতন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এ অবস্থায় ১৯১২ সালে নিউজিল্যান্ডের গভর্নর ইসলিংটনের সভাপতিত্বে একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হয় যার সদস্য সংখ্যা ছিলো ১০ জন। পরবর্তীকালে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড এ কমিশনের সদস্য ছিলেন। কমিশন তিনটি নীতির ভিত্তিতে পর্যালোচনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। নীতিগুলো হলোঃ ব্রিটিশ ভারতে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উন্নতমান বজায় রাখার নীতি; ভারতে ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ়করণ; এবং ভারতীয়দের যুক্তিযুক্ত দাবী পূরণ করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা। কমিশন ১৯১৫ সালে রিপোর্ট প্রণয়ন সমাপ্ত করে এবং তা প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে।

তখনকার প্রচলিত ব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ লাভের সুযোগ ছিল না । ১৯১৫ সালে ১২৫০ জন সিভিল সার্ভেন্টের মধ্যে ৬৩ জন অর্থাৎ শতকরা মাত্র ৫ জন ছিলেন ভারতীয়। কমিশন শতকরা ৭৫ জনকে ব্রিটেনে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এবং শতকরা ২৫ জনকে

মনোনয়নের মাধ্যমে ভারত থেকে নিয়োগ করার সুপারিশ করে। এ ছাড়া ভারতীয়রা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সিভিল সার্ভিসে যোগ দিতে পারবেন। এভাবে সিভিল সার্ভিসের ১৮৯ জন কর্মকর্তা ভারতীয়দের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন। জেলা ও সেশন জজ আদালতের ৪০টি পদ ভারতীয়দের জন্য সংরক্ষিত হয়। আর উচ্চতর প্রশাসনিক পর্যায়ে ৪১টি পদ প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস থেকে পূরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত ভারতীয়দের ইংল্যান্ডে তিন বছর প্রশিক্ষণ লাভ করতে হয়।

সিভিল সার্ভিসে অধিক সংখ্যক ভারতীয়কে নিয়োগ প্রদানের সুপারিশের পাশাপাশি বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করে কমিশন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ২৩ বছর থেকে ১৯ বছর-এ নামিয়ে আনার সুপারিশ করে। কমিশনের যুক্তি ছিলঃ প্রথমতঃ সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ২৩ বছর হলে প্রশিক্ষণের পর ২৫ বছরের আগে তারা কর্ম ব্যবস্থায় যোগ দিতে পারবে না। ফলে তাদের মানসিক প্রকৃতিকে ঢেলে সাজানো সম্ভব হবে না। দ্বিতীয়তঃ ঐ বয়সে কর্মকর্তারা সংসারী হলে তাদের দক্ষতার মান ক্ষুন্ন হতে পারে। তৃতীয়তঃ এর ফলে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময়সীমা কমে যাবে। কার্যতঃ ভারতীয়দের শিক্ষা জীবন শেষ করতে তুলনামূলকভাবে বয়স বেশী হয়ে যেতো। ফলে ভারতীয়দের পক্ষে এত অল্প বয়সে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ ও উত্তীর্ণ হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তাছাড়া সুশাসনের জন্য সব সম্প্রদায় থেকে আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব শাসন ব্যবস্থায় থাকা প্রয়োজন। ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার একইভাবে হয়নি। ফলে অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ করা হলে অসাম্য আরও বাড়বে। তাই কমিশন ভারতীয়দের মধ্য থেকে নিয়োগের ক্ষেত্রে মনোনয়ন প্রথার সুপারিশ করে। এক হিসেবে দেখা যায় ১৯১৩ সালে মুসলমানগণ ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ২২ জন হলেও চাকুরী ক্ষেত্রে শতকরা ১৭ ভাগ পদের অধিকারী হয়েছে। মনোনয়ন প্রথার দুর্নীতি সম্পর্কে কমিশন সজাগ ছিলেন। কমিশন মনোনয়ন কর্তৃপক্ষের নিরপেক্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রার্থীদের সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে।

ইসলিংটন কমিশন সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করে। তবে ভারতীয়দের চেয়ে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের ভারতে চাকুরী করতে উদ্বুদ্ধ করাই ছিলো এ বৈষম্যের কারণ- বর্ণ বৈষম্য নয়।

কমিশন বিভিন্ন যুক্তিতে যুগপৎ পরীক্ষা গ্রহণে দাবী নাকচ করে। প্রথমতঃ ব্রিটেন ও ভারতে যুগপৎ পরীক্ষা হলে প্রশাসনে অদক্ষ ও অশিক্ষিত লোকের প্রবেশ ঘটবে এবং প্রশাসন ব্যবস্থার মান অবনত হবে। দ্বিতীয়তঃ এর ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য কিছু কিছু বিষয় সংযোজিত হওয়ার কারণে শিক্ষা ব্যবস্থার গতি ব্যাহত হবে এবং আঞ্চলিক ভাষার গুরুত হ্রাস পাবে। তৃতীয়তঃ যুগপৎ পরীক্ষার ফলে সমমান রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

ভারতীয় কর্ম ব্যবস্থাকে স্তরভিত্তিক ও আনুভূমিক-এ দুপর্যায়ে বিভক্ত করার জন্য ইসলিংটন কমিশন কর্মব্যবস্থাকে কাজের ভিত্তিতে প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী ও চতুর্থ শ্রেণী-এ চার ভাগে বিভক্ত করে। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা দৈহিক কর্মে, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর করণিক এবং দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তারা প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত থাকবেন। নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায়ে পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তারা উচ্চতর পর্যায়ে সরাসরি নিয়োজিত কর্মকর্তাদের অনুরূপ সুযোগ সুবিধা লাভ করবেন। আনুভূমিক ভিত্তিতে ভারতীয় কর্ম ব্যবস্থাকে রাজকীয় সিভিল সার্ভিস, কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস, প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস ও অধঃস্তন সিভিল সার্ভিস এ চারভাগে বিভক্ত করার প্রস্তাব করা হয়।

কমিশন চাকুরীর শর্তাবলী সহজ করার সুপারিশ করে। ব্রিটিশ ও ভারতীয় কর্মকর্তাদের জন্য স্বতন্ত্র ছুটি বিধির সুপারিশ করা হয়। পূর্বে ভারতীয় কর্মকর্তাদের নিজ নিজ পেনশন তহবিলে চাঁদা দিতে হতো; কমিশন তা রহিত করার সুপারিশ করে। পূর্তকর্ম, রেল প্রভৃতি কয়েকটি ব্যতীত অন্যত্র সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়োগ বন্ধ করার সুপারিশ উল্লেখযোগ্য।

বেসামরিক প্রশাসন থেকে সামরিক কর্মকর্তাদের সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা, ভারতীয়দের জন্য কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা সত্ত্বেও ইসলিংটন কমিশনের রিপোর্টে ভারতীয়দের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা হ্রাস ও যুগপৎ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দাবী নাকচ ভারতীয়দের ক্ষুদ্ধ করে তোলে। মনোনয়ন পদ্ধতিও সমালোচনার সম্মুখীন হয়। অনেকের মতে এ পদ্ধতি ছিলো অযোগ্য ব্যক্তিদের দাক্ষিণ্য বিতরণ এবং এর মাধ্যমে অনুগ্রহপুষ্ট অনুগত শ্রেণী তৈরী করে ভারতে ব্রিটিশ শাসন আরো দীর্ঘায়িত করার প্রয়াস। স্যার ভ্যালেন্টাইন মিরোলের মতে ইসলিংটন কমিশনের সুপারিশ ভারতীয়দের শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করেনি এবং ব্রিটিশ কর্তকর্তাদের মনোভাবেও কোন পরিবর্তনের সূচনা করেনি।

ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক সংস্কার (মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ড) রিপোর্ট ১৯১৯

ইসলিংটন কমিশনের সুপারিশ ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করতে পারেনি বরং উত্তেজিত করেছিলো মাত্র। এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয়দের সহযোগিতা ব্রিটিশ শাসকদের ভারতে উদারনীতির সূচনায় অনুপ্রাণিত করে। ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট ভারত সচিব এডউইন মন্টেগু কমন্সসভায় ভারতের শাসন ব্যবস্থায় অধিক হারে ভারতীয়দের অংশগ্রহণ এবং ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করে। ভারত যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ ঘোষণায় একথাও বলা হয়।

উক্ত ঘোষণার আলোকে কমিশন ভারতে দায়িত্বশীল সরকার গড়তে প্রশাসনে অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ করার সুপারিশ করে। এর মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ব কমে আসবে। মন্টেগু-চেমসফোর্ড কমিশন সুপারিশ করে যে, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের শতকরা ৩৩ ভাগ কর্মকর্তা ভারত থেকে নিয়োগ লাভ করবেন। পরবর্তী কমিশন গঠন না হওয়া পর্যন্ত আরো শতকরা ১.৫ ভাগ পদে ভারতীয়রা নিযুক্ত হবেন। তবে এ ভারতীয়করণ নিঃশর্ত ছিলো না। নবাগত কর্মকর্তারা যাতে প্রশাসনের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন না করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখার কথা বলা হয়। একই চাকুরীর বিভিন্ন গ্রেডে ভারতীয় ও ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের বন্টন সুষম হতে হবে। প্রাদেশিক বিভিন্নতা বজায় রেখে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ভারতীয়দের নিয়োগের হার বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করতে হবে। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বৃদ্ধি না করার সুপারিশ করা হয়। অর্থাৎ ভারতীয়করণ অবাধ ছিলো না। কমিশন প্রকৃতপক্ষে ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বজায় রেখে এবং ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের প্রভাব অক্ষুন্ন রেখে তারপর অধিকসংখ্যক ভারতীয়ের নিয়োগের পক্ষপাতি ছিলো।

মন্টেগু-চেমসফোর্ড কমিশন প্রশাসনে ভারতীয় কর্মকর্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি, একই সংগে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখার সুপারিশ করে। ভারতে স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ভারতীয় কর্মকর্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে যাতে ব্রিটিশ কর্মকর্তারা হতাশ হয়ে অধিক সংখ্যায় চাকুরী ছেড়ে না দেন সেজন্য কমিশন তাদের বেতন, ছুটি, পেনশন বৃদ্ধির সুপারিশ করে। ১৯১৯ সালে ভারত সচিবের ক্ষমতা হ্রাস এবং মন্ত্রীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। প্রদেশগুলোতে নির্বাচিত সরকার গঠন করা হয়। এ পরিস্থিতি অসহনীয় মনে হওয়ায় অনেক ব্রিটিশ কর্মকর্তা চাকুরী ছেড়ে অবসর নেন।

পূর্বে প্রশাসনিক কর্মকর্তারাই নীতি নির্ধারণ করতেন। কিন্তু ভারতে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে এ ভূমিকার পরিবর্তন হয়। এ রিপোর্টে আশা করা হয় যে, এখন থেকে উচ্চতর পর্যায়ের কর্মকর্তারা মন্ত্রীদের উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করবেন ও নীতি নির্ধারণে নিরপেক্ষভাবে মন্ত্রীদের সহায়তা করবেন। তাঁরা সততা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে মন্ত্রীদের সহায়তা করবেন এবং নির্ধারিত নীতি নিরপেক্ষভাবে বাস্তবায়ন করবেন। ভারতের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশ ও অগ্রগতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্যও তাদের নির্দেশ দেয়া হয়। কর্মকর্তাদের সাথে সহযোগিতা, শুভেচ্ছা ও সহনশীলতার ভিত্তিতে সম্পর্ক নির্ধারণ করার জন্য ভারতীয় রাজনীতিবিদদের পরামর্শ দেয়া হয়।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে আংশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও ভারতীয় মন্ত্রীদের আংশিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ফলে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। রিপোর্টে ভারতীয় মন্ত্রীদের আংশিক নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা যাতে দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন সেজন্য তাঁদের অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস সংগঠনে বৃটিশ কর্মকর্তাদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁরা যাতে ব্যাপক সংখ্যায় দেশ ত্যাগ না করেন সেজন্য তাঁদের অধিকার সংরক্ষিত থাকতে হবে। ফলে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার আওতায় আনা হয়।

ভারতে আংশিক স্বায়ত্বশাসন মঞ্জুর এবং ভারতীয় মন্ত্রীদের কিছুটা নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা প্রদানের ফলে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অপ্রতিহত ক্ষমতা কিছুটা হ্রাস পায়। শাসকের ভূমিকা থেকে কর্মকর্তার ভূমিকায় পরিবর্তনে অনেক কর্মকর্তাই অস্বস্তিবোধ করেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ভারতীয় কর্মকর্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের মনে এ বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, একদিন তাঁদের ভারত ছেড়ে যেতেই হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধজনিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে বেতন ভাতার সামঞ্জস্য বিধান না করায়ও ব্রিটিশদের চাকুরীর মোহ কমে যায়। ফলে বহু সংখ্যক ইউরোপীয় চাকুরী ছেড়ে স্বদেশ পাড়ি দেন। এদের সংখ্যা ১৯২১ সালে ছিলো ২০০ জন এবং ১৯২৪ সালে এই সংখ্যা ৩৪৪-এ উন্নীত হয়। ফলে সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯২২ সালে ভারত ও ব্রিটেনে পরীক্ষার দাবী স্বীকৃত হয়। ১৯২৫ সালে ভারতীয় প্রার্থীর সংখ্যা ছিলো ৬২ জন। ১৯৩৪ সালে তা ২৬২ জনে উন্নীত হয়। ইউরোপীয় প্রার্থীর সংখ্যা ১৯২৫ সালে ছিলো ৭১ জন, ১৯২৮ সালে ১২১ জন এবং ১৯৩৫ সালে ৭১ জন। সামগ্রিকভাবে তখনো ভারতীয় কর্মকর্তাদের সংখ্যা ছিলো নগণ্য। ১৯২৪ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মাত্র শতকরা ১৩ ভাগ সদস্য ছিলেন ভারতীয়।

ভারতের উচ্চতর কর্মব্যবস্থা রাজকীয় লী কমিশন (১৯২৩)

মন্টেগু-চেমসফোর্ড কমিশনের রিপোর্ট ভারতবাসীকে একদিকে আশান্বিত করে, অন্যদিকে, অনেকের মতে ভারতীয়দের আশা আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে প্রাপ্তি ছিলো সামান্য। নতুন নীতির বাস্তবায়ন ছিলো মন্থর। যুদ্ধোত্তর মূল্যস্ফীতিও চাকুরী ব্যবস্থার সংস্কারে পদক্ষেপ গ্রহণে ভূমিকা রাখে। এ অবস্থায় ১৯২৩ সালে ফেয়ারহামের লর্ড লী-কে সভাপতি করে একটি রাজকীয় কমিশন গঠিত হয়।

লী কমিশন ভারতের কর্মব্যবস্থাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে। যথা (১) সংরক্ষিত বিষয়ে কর্মরত প্রশাসনিক বিভাগ, (২) হস্তান্তরিত বিষয়ে কর্মরত প্রশাসনিক বিভাগ, (৩) কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে কর্মরত প্রশাসনিক বিভাগ। সংরক্ষিত বিষয়ে নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের ভার ছিল ভারত সচিবের উপর। হস্তান্তরিত বিষয়ে নিয়োগের ক্ষমতা ছিলো প্রাদেশিক সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রাধীনে প্রশাসনিক বিভাগসমূহে তিন ভাবে নিয়োগ হতো। ভারত সচিব কর্তৃক সরাসরি, ভারত সরকার কর্তৃক এবং আংশিকভাবে ভারত সচিব ও ভারত সরকার কর্তৃক। লী কমিশন প্রশাসনে দ্রুতহারে ভারতীয়দের নিয়োগের সুপারিশ করে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের শতকরা বিশ ভাগ পদ প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের সুপারিশ করা হয়। আর প্রত্যক্ষভাবে নিয়োগ প্রাপ্তদের অর্ধেক হবেন ভারতীয় ও অবশিষ্টাংশ ইউরোপীয়।

কমিশন কর্মকর্তাদের চাকুরীর শর্তাবলী উদারীকরণের সুপারিশ করে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। লী কমিশন ভারতীয় সিভিল, বন, ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করে। অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ লাভ এবং ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার ফলে অনেক ইংরেজ চাকুরীর প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। কমিশন সিভিল সার্ভিসের ইউরোপীয় সদস্যদের জন্য বৈদেশিক ভাতা, পরিবারের সদস্যদের জন্য ভ্রমণ ভাতা, অর্জিত অর্থ ব্রিটেনে প্রেরণের সুবিধা প্রভৃতির সুপারিশ করে। এ ছাড়া কমিশন বিভিন্ন সার্ভিসের জন্য উদার পেনশন ও বিশেষ চিকিৎসা সুবিধার সুপারিশ করে।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হলেও দীর্ঘ চার বছরের মধ্যে কমিশনের রূপরেখা নির্ধারিত হয়নি। যদিও ভারত সচিব ও প্রাদেশিক সরকারগুলোর মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা চলছিলো। প্রশাসনকে দক্ষ ও প্রভাবমুক্ত রাখতে হলে একটি শক্তিশালী পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রয়োজন। এ কারণে লী কমিশন পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট ভারত সচিব কর্তৃক নিযুক্ত একটি শক্তিশালী পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনের সুপারিশ করে। একজন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গঠিত এ কমিশনের ব্যক্তিবর্গের পদমর্যাদা ও

পারিশ্রমিক হাই কোর্টের বিচারপতির সমান। এর মৌল দায়িত্ব প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাছাইয়ের মান নির্ধারণ, প্রয়োজনে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণ এবং তাদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ।

লী কমিশনের সুপারিশের পর ভারতের সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়করণের পথ প্রশস্ত হয়। তবে এই সুপারিশ তখন কোন পক্ষকেই খুশী করতে পারেনি। ভারতীয়করণের সুপারিশ ইউরোপীয়দের অসন্তুষ্ট করেছে। বর্ধিত আর্থিক সুবিধাদিও অসন্তোষকে দূর করতে পারেনি। এ বর্ধিত সুবিধা ভারতীয়দের ক্ষুব্ধ করেছে। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯২৬ সালে ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা হয়। হস্তান্তরিত বিষয়ে সর্ব ভারতীয় পর্যায়ে নিয়োগ বন্ধ হয় ১৯২৪ সালে। ভারত সচিব শুধুমাত্র সিভিল সার্ভিস, বন সার্ভিস, পুলিশ সার্ভিস, ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের সেচ শাখা ও বন সার্ভিসের কর্মকর্তা নিয়োগ অব্যাহত রাখেন। আর্থিক সুযোগ সুবিধা অপর্যাপ্ত মনে হওয়ায় এবং ১৯২২ সালে যুগপৎ পরীক্ষা শুরু হওয়ায় ইউরোপীয় প্রার্থীর সংখ্যা হ্রাস ও ভারতীয় প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ভারতীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি ও ইউরোপীয়দের সংখ্যা হ্রাসের ফলে ভারত সচিব মনোনয়নের মাধ্যমে কর্মকর্তা নিয়োগ শুরু করেন, যদিও এটা সমালোচিত হয়। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত এ প্রথা চালু থাকে।

ভারতীয় সংবিধিবদ্ধ (সাইমন) কমিশন ১৯৩০

লী কমিশনের অনেক সুপারিশ বাস্তবায়িত হওয়ার পরও ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন প্রশ্নের জন্ম হয়। এসব প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩০ সালে জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন ভারতে কর্মরত পাঁচটি কর্মব্যবস্থার কার্যাবলীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ও ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের নিয়োগ ও পরিচালনার দায়িত্ব ভারত সচিবের উপর ন্যস্ত করার সুপারিশ করে। এদু'টি সার্ভিসের নিয়োগ হবে সর্ব ভারতীয় পর্যায়ে।

সাইমন কমিশন লী কমিশনের অধিক সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগের সুপারিশকে যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করে। কমিশন নতুন যুক্তির অবতারণা করে ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও প্রাধান্য বজায় রাখার সুপারিশ করে। এর পক্ষে যুক্তি ছিলো দ্বিবিধ। প্রথমতঃ ভারতে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক বিরোধ কর্মকর্তাদের মধ্যেও সংক্রমিত হচ্ছে এবং ভারতীয় কর্মকর্তারা অনেকেই সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ছেন। এ অবস্থায় সততা, নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখার জন্য ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের প্রাধান্য অপরিহার্য। দ্বিতীয়তঃ ভারতে নব প্রতিষ্ঠিত দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা চালু রাখতে এবং গণতন্ত্রকে দৃঢ়মূল করতে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের

সেবা অপরিহার্য। শিক্ষিত ভারতীয় মহলে যুক্তি দু'টো তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কারণ উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ব্রিটিশ শাসকদের 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল' নীতিরই ফলশ্রুতি। অন্য দিকে ভারতীয় মন্ত্রীদের অধীনে কাজ করতে নারাজ বিপুল সংখ্যক ব্রিটিশ কর্মকর্তার ভারত ত্যাগ গণতন্ত্রের প্রতি তাদের শ্রদ্ধার প্রমাণ দেয় না।

কমিশন ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের বিশেষ সুবিধা দান ও ভারতে পূর্ণ মাত্রায় দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে কোন কর্মকর্তা ভারত ছেড়ে চলে যেতে চাইলে তিনি যেন সহজে সকল সুবিধাসহ যেতে পারেন তার নিশ্চয়তা বিধানের সুপারিশ করে। কমিশনের মতে দক্ষ ও যোগ্য ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের সকল সুযোগ সুবিধা ও অধিকার সংরক্ষণ এবং নবাগতদের জন্যও তা নিশ্চিত করতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সকল সুযোগ সুবিধাসহ অবসর গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। কমিশন প্রদেশগুলোতে প্রয়োজনবোধে পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনের সুপারিশ করে। প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষে যুক্তি হলো প্রথমতঃ প্রাদেশিক সার্ভিসের কর্মকর্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ; দ্বিতীয়তঃ নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে মন্ত্রীদের অব্যাহতি; এবং তৃতীয়তঃ স্বজনপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান। কমিশনের মতে এ পদক্ষেপের ফলে শাসন বিভাগ সততা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করতে পারবে। ব্যয় সংকোচনের জন্য একাধিক ক্ষুদ্র প্রদেশ মিলে একটি প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা সম্ভব হবে।

উপসংহার

এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ প্রশাসন তিনটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ভারত শাসন করে। এগুলো ছিলো রাজস্ব সংগ্রহ (সম্পদ লুণ্ঠন ও পাচার), আইন- শৃঙ্খলা রক্ষা (স্বাধীনতার স্পৃহাকে যে কোন মূল্যে দমন) এবং প্রতিরক্ষা (অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তিকে পর্যুদস্ত করে ভারতকে নিজ দখলে রাখা)। এসব বাস্তবায়নের জন্য দমন লুণ্ঠনের পাশাপাশি ভেদনীতি অর্থাৎ হিন্দু- মুসলমানকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করানোর মতো জঘন্য কৌশলও তারা অবলম্বন করে। দিন বদলের সংগে সংগে ভারতীয়দের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তীব্রতর হতে থাকে। এ অবস্থায় ক্রমবর্ধমান হারে প্রশাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের নিয়োগের মাধ্যমে তাদের ক্ষোভ প্রশমিত করে স্বাধীনতার আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার প্রয়াস চালানো হয়। দ্বিতীয়তঃ অবাধ্য ভারতীয়দের দমনের জন্য কিছু ভারতীয়ের প্রয়োজন ছিলো। কারণ ভারতের নাড়ী নক্ষত্রের খবর এসব ভারতীয়ের বেশী জানা ছিলো। আন্দোলন, সংগ্রাম দমনে কোন কোন ক্ষেত্রে ইংরেজদের চেয়ে ভারতীয়রা অধিকতর নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ দমনে পাঞ্জাবী সৈন্যদের ভূমিকা এ প্রসংগে উল্লেখ করা যায়।

পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ব্রিটিশ আমলে আন্দোলন দমনে যথেষ্ট পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ভারতে লর্ড মেকলের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী (সিভিল সার্ভিসের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা) মনস্তাত্তিকভাবে ইংরেজ তৈরীর কারখানায় পরিণত হয়। এসব ভারতীয় কর্মকর্তা ইংরেজদের অনুকরণে নিজেদের ভারতীয়দের প্রভু হিসেবে ভাবতে এবং সে অনুযায়ী আচরণ করতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তারা জনরোষের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের হাতিয়ারে পরিণত হন। এহেন স্বজাতি বিদ্বেষী মানসিকতা দূর করতে কোন সংস্কার কমিশনই আগ্রহী ছিলো না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতে ব্রিটিশ শাসন দীর্ঘস্থায়ী করা এবং সে অনুযায়ী প্রশাসনের প্রয়োজনীয় সংস্কারই ছিলো এসব কমিশনের লক্ষ্য । উপরন্তু বিভিন্ন ভাবে প্রভুসুলভ মানসিকতা লালনে কর্মকর্তাদের উস্কে দেয়া হয়। কারণ ভারতীয় কর্মকর্তারা যথার্থ দেশপ্রেমিক হলে ব্রিটিশ শাসন ১৯০ বছর স্থায়ী হতো না। এর মাঝেও যদিও বেশ কিছু ভারতীয় ব্রিটিশের চাকুরী করেও নানা ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করেন। তবে তাঁরা নেহায়েতই ব্যতিক্রম।

ব্রিটিশ শাসন অবসানের অর্ধ শতাব্দীরও বেশী সময় পার হয়েছে, কিন্তু সাবেক ব্রিটিশ ভারতের অংশ বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা এখনো তার ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। বিশেষ করে কর্মকর্তাদের জন্য বিচ্ছিন্ন এবং প্রভুসুলভ মানসিকতার এখনো অবসান হয়নি। এটাকে ব্রিটিশ শাসকদের কৃতিত্ব বলা যায়। এছাড়া ব্রিটিশ শাসনে উপমহাদেশের যতটুকু আধুনিকায়ন হয়েছে তার আংশিক কৃতিত্ব ব্রিটিশ প্রশাসনের । বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত প্রশাসন ব্যবস্থা ব্রিটিশ প্রশাসন ব্যবস্থার ছায়া বই কিছু নয়। এ ব্যবস্থা ও কাঠামো মধ্যযুগের অসংগঠিত ও বিশৃংখলা অবস্থার চেয়ে উৎকৃষ্টতর হলেও একটি স্বাধীন দেশের চাহিদা মেটানোর উপযুক্ত নয় তা নিশ্চিত করে বলা যায়।

সহায়ক গ্রন্থ

আহমদ, এমাজউদ্দিন (১৯৮৬)। *বাংলাদেশ লোক প্রশাসন*। ঢাকাঃ গোল্ডেন বুক হাউজ।

ওয়ালিউল্লাহ, মোহাম্মদ (১৯৬৯)। *আমাদের মুক্তিসংগ্রাম*। ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান।

রায়, অতুল চন্দ্র (১৯৮৪)। *ভারতের ইতিহাস* (২য় খন্ড)। কলিকাতাঃ মৌলিক লাইব্রেরী।

Chowdhury, Lutful Hoq (1979). *Social Change and Development Administration in South Asia,* Dhaka. NIPA.

Marx, Karl &Engels, Frederick (1964)- *The First Indian War of Independence.* Moscow: Progress Publishers.